গাঁয়ের ছেলে

মূল ঃ ইউসুফ সিবাই

অনুবাদ ঃ এলহাম হোসেন

(ইউসুফ সিবাই । পুরো নাম ইউসুফ মোহামেদ মোহামেদ আব্‌দেল ওয়াহাব আল সিবাই। জন্ম মিশরে ১৭ জুন, ১৯১৭ সাল। মৃত্যু ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সাল। আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে মিশরের সংস্কৃতি মন্ত্রীও ছিলেন। লিখতেন আরবী ভাষায়। এক ডজনেরও বেশী উপন্যাস লিখেছেন । সেগুলোর সিনেমারূপ বিশ্বজুড়েই জনপ্রিয় হয়েছে। নাটকও লিখেছেন। লিখেছেন ২২টি ছোটগল্প। **'গাঁয়ের ছেলে'** গল্পটি তাঁর 'The Country Boy' ছোটগল্পের বঙ্গানুবাদ।)

এই গল্পে আছে চারটি প্রধান চরিত্র, আর সব সম্ভাবনা মিলিয়ে এঁদের মাত্র একজন আজও বেঁচে আছেন। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, তাঁদের দু'জন ভবলীলা সাঙ্গ করে পরপারে যাত্রা করেছেন। আর তৃতীয় জন, কেবল আল্লাহই জানেন, তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে।

আমি জানি না এই চরিত্রগুলোর নাম পরিবর্তন না করতে কী আমাকে প্ররোচিত করেছে, আর তাই তাঁদের কাল্পনিক নাম নিয়ে ভাবার ঝুট-ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম, কারণ সম্ভবত আলস্য বা আমার নিশ্চিত ধারণা যে, গল্পটি ছাপা হলে এঁদের কেউ বিব্রত বোধ করবেন না। এত বেশী আত্মবিশ্বাসের কারণ হলো এই চরিত্রগুলোর মধ্যকার একজন হলেন আমার বাবা মোহামেদ সিবাই। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ যদি তাকে দীর্ঘ জীবন দান করতেন তবে আমাকে সুযোগ না দিয়ে তিনি নিজেই গল্পটা ছাপতেন, যেভাবে তিনি মরহুম শেখ আব্দুল রহমান বারকাক্বীর ঘটনাগুলো সাপ্তাহিক *বালাগ* পত্রিকায় ছাপতেন। আল্লাহ যেহেতু তাঁকে এটা লেখার সুযোগ দেন নি, তাই তাঁর পক্ষ থেকে আমাকেই এ কাজটি করতে হচ্ছে। আর ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়, যেমনটি তারা বলে থাকে, যে মৃতরা না-কি আমাদের দেখতে পায় এবং আমরা যা করি সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, তবে আমি সাহস করে বলতে পারি, তিনি গল্পটি পড়তেন আর অট্টহাসিতে স্বর্গের আনাচে কানাচে ধ্বনিত করতেন, যেমনটা তিনি জীবদ্দশায় এই মর্ত্যে করতেন।

গল্পটা অনেক আগেই শুরু হয়– আমি নিশ্চিত এটি ১৯১৭ সালেরও আগে, বলতে গেলে আমার জন্মেরও আগে– গাইথ্ আল ইদ্‌দা স্ট্রীটের একটা বইয়ের দোকান যা বাব আল খাল্‌ককে আব্‌দিনের সাথে যুক্ত করেছে।

দু'জন লোক বইয়ের দোকানে বসে আছে– দোকানের মালিক আর মালিকের বন্ধু। প্রথমজন হলেন ধর্মীয় নেতা, মাথায় পাগড়ী পড়া। আর দ্বিতীয়জন আমার বাবা, পড়নে ইউরোপীয় পোশাক। উভয়েই সে সময়ের সাহিত্যের আঙ্গিনায় পরিচিত নাম। আমি আমার বাবার কথা বেশ ভালোভাবেই মনে করতে পারি- মোটা শরীর, প্রশস্ত কাঁধ, লাল ভরাট মুখ, পায়ের উপর পা তুলে বেতের চেয়ারে বসা, যেন শেফার্ড হোটেলে বসে আছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসা ঢিলে-ঢালা জোব্‌বা পড়া আর বেশ ডাগর শরীরের উপর ঝুলিয়ে রাখা রাজকীয় কাফতানে শেখ আব্দুল রহমান । তাঁর মুখমন্ডল আমার বাবার মুখমন্ডলের চাইতে খুব একটা কম গোলাপী ও সাদা নয়। পায়ের উপর পা তুলে বসে পাশে রাখা তামাকের নলের একপ্রান্তে মুখ লাগিয়ে গড়গড় করে টেনে যাচ্ছেন।

দুই বন্ধুকে একত্রিত করেছেন শেখ আল ফাক্ক যিনি তাঁর ছেলে ঈমামকে হাতে করে নিয়ে এসেছেন। শেখ আল ফাক্ক সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না। তবে আমি এটুকু জানি যে, তিনি একজন বেশ খোদাভীরু লোক। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করেন। অত্যন্ত সৎ। গ্রামেই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে ছেলেকে কায়রোতে নিয়ে এসেছেন হাইস্কুলে পাঠানোর জন্য। শলা-পরামর্শের জন্য দু'জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং আলোকিত মানুষের বাইরে আর কে-ই বা বেশী নির্ভরযোগ্য হবেন? জনাব সিবাই ও বারকাক্বী উভয়ের সাথেই তাঁর খু–উ-ব ভালো বন্ধুত্ব।

এজন্যই ওই ভালো লোকটি তার ছেলেকে কায়রোতে নিয়ে এসেছেন। তাঁর দুই বন্ধুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে করতে বইয়ের দোকানে এসে এঁদের ধরে ফেললেন। সালাম বিনিময়ের পর তিনি তাঁর আগমণের হেতু ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

"জনাব সিবাই, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু লুকাবো না। কায়রোতে আমার ছেলেকে নিয়ে ভয়ে আছি। আমি এ শহরের দুষ্কর্ম ও অনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে শুনেছি। আর তাই ভয় হয়, ছেলেটার চোখ খুলে না যায়, আর সে নষ্ট হয়ে না যায়। আমি ভাবলাম, ছেলেটার দেখাশুনার জন্য আপনাদের চাইতে বেশী ভালো আর কেউ হবে না। আমি ছেলেটাকে আপনাদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছি এই ভেবে যে সে যেন তার নিজের ঘরেই আছে, তাই নয় কী?"

"প্রিয় শেখ", দু'জন একই সুরে জবাব দিলেন, "ছেলেটা আমাদের নিজেদের ছেলের মতোই। শান্ত হোন। তাকে নিয়ে দু:শ্চিন্তা করবেন না।"

"আমিও ঠিক এ-কথাই বলি– আপনাদের চাইতে অধিকতর ভালো আর কে হবে?"

"এটি আপনার বদান্যতা।"

"আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কল্যাণ করুন।"

এ কথা বলে শেখ আল ফাক্ব ছেলেকে দুই বন্ধুর কাছে আমানত রেখে বিদায় নিলেন। গল্পের চতুর্থ চরিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এখন আর কী-ই বা বাকি আছে: ইনি হলেন ঈমাম আল ফাক্ব।

পাঠক খুব ভালোভাবেই কল্পনা করতে পারেন যে, এই ঈমাম, শেখ আল ফাক্বের ছেলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেছিল, আর তার বাবার ভয় ছিল যে, কায়রোর কুকর্মগুলো এই নাদান ছেলেটার চোখ খুলে দেবে। যদিও ঈমাম মোটেও এমন কোন জিনিস নয়। সেই সময়ের প্রাইমারী স্কুলের ছেলে-পেলে আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ গজানো ছেলের বাপের বয়সী। এই ছাত্র ঈমাম আল ফাক্ব একেবারেই বেয়াড়া। যদিও তাকে শান্ত-শিষ্ট দেখায়, স্থির জলাধারের গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়। চোখ বন্ধ করে মাথা নামিয়ে সকল প্রকার লজ্জা ও সংকোচ মাখিয়ে বিগলিত বিশুদ্ধতায় সে তার বাপের পাশে বসে থাকে, আর সারাটা সময় এমন কোন গণিকালয় বা গাঁজার আসর নাই যার সে খোঁজ-খবর রাখে না।

এই হলো নিষ্পাপ, খোদাভীরু, ঋজু আর অনভিজ্ঞ সন্তান যার বাপ ভাবে যে কায়রোর কুকর্মসমূহ তাকে কলুষিত করবে। এই ছেলেটাকেই আমার বাবা আর তার বন্ধুর হেফাজতে রাখা হলো। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমার বাবার নিজের সন্তানদেরই লালন-পালনের সময় নেই, আর তো অন্যের সন্তান। শেখ বারকাক্বীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

এই খোদাভীরু তরুণ প্রথম যে কাজটি করলো তা হলো, সে ন্যাশনাল স্কুলের হেড মাষ্টারের কাছে গেল, তারপর দরকষাকষি করে স্কুলে শুধু ভর্তি হওয়ার সুবাদেই তার বেতনের চারভাগের একভাগ মওকুফ করে নিল। সে ক্লাশে যোগ দিয়ে তাঁকে বিরুক্ত করবে না, বই নেবে না বা এরকম কোন কিছুই করবে না। তার শুধু একটাই দাবী, আর তা হলো হলো, হেডমাষ্টার তাকে ভর্তি করে নিক আর পাঁচ পাউন্ড ছাড় দিক। স্কুলে ভর্তি হয়েই ঈমাম আল ফাক্ব তার অবশিষ্ট ফি দিয়েই কায়রোতে তান্ডব চালিয়ে গেল।

দিন, রাত, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, শোনা যায়, ঈমাম উচ্ছন্নে গেছে। তার যশ ছড়িয়ে পড়ল শহরের গণিকালয়ে আর আজে-বাজে জায়গাগুলোতে । গ্রামের লোকেরা, যারা কায়রোতে আসতো তাদের মাধ্যমে ছেলের আমলনামা বাপের কাছে পৌঁছতে লাগলো। প্রথমে শেখ বিশ্বাস করলেন না, ভাবলেন, ঈর্ষাকাতর হয়ে তার বিরুদ্ধে এসব ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। অবশেষে, যদিও তার মনে আগেই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, তিনি ভাবলেন যে, নিজেই কায়রোতে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা নিজের চোখে দেখে মনটাকে বুঝ দেবেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হয়ে ছেলেকে সব অভিযোগ ও গুজবের ব্যাপারে সামনা-সামনি চ্যালেঞ্জ করলেন। ছেলে তো চোখ ঢেকে লোকজনের দুষ্টামি আর অপবাদসূচক মিথ্যা গুজন ছড়ানো নিয়ে আপসোস করতে লাগলো।

বাপ কিছুটা শান্ত হলো; তার সংশয়ও কমলো। সব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে ছেলেকে নিয়ে রওনা দিলেন শেখ বারকাক্বী আর মি. সিবাই এর সাথে দেখা করতে বেরিয়ে পড়লেন।

শান্ত-শিষ্ট ছেলের হাত ধরে শেখ সেই বইয়ের দোকানে এসে পৌঁছলেন, যেটি এই দুজন শিক্ষিত লোকের যোগ্য মিলনস্থল।

সালাম পর্ব শেষ করে শেখ আল ফাক্ব শুরু করলেন, "বন্ধুগণ, আমি কিছুই লুকাবো না। আমি ঈমামের ব্যাপারে বেশকিছু বাজে কথা-বার্তা শুনছি। "

"আশা করছি, খারাপ কিছু না?"

"আমাকে বলা হয়েছে যে, তার আচার-আচরণ অপমানজনক। সে সবখানে খারাপ আচরণ প্রদর্শণ করছে। লেখাপড়ায় সামান্যতম মনোযোগ নাই। স্কুলেও যায় না। সে আসলে উচ্ছন্নে গেছে। "

তাদের মধ্যে বিরাট বিস্ময় দেখা দেয়। " আমাদের ঈমাম? শেখ, কে বলে এসব কথা? কারা এমন কথা বলতে পারে? আল্লাহ মাফ করুন। ঈমাম তো এখনও বিড়ালছানা যার চোখ এখন খোলেই নি। "

যে বিড়ালছানার এখনও চোখই খোলে নি তাকে তো দেখতে নিরীহ ও আত্মবিস্মৃতই মনে হয়।

"খোদার কসম, তোকে এর মূল্য দিতে হবে ঈমাম, কুত্তা কোথাকার," বাবা নিজেই নিজেকে বলতে লাগলেন, "আমাদের এই পরিস্থিতিতে ফেললি।" এরপর ঈমামের বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। , " ঈমাম? তার আচরণ অপমানজনক? কেন, বাড়ি থেকে সোজা স্কুলে, আবার স্কুল থেকে সোজা বাড়িতে। লেখাপড়া করে সে নিজেই নিজেকে শেষ করে দিচ্ছিল, আর আমরা তাকে একটু দম নিতে বলেছিলাম, তাই না ঈমাম?"

ঈমান মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

দুই বন্ধু মিলে ঈমামের গুণকীর্তন করে বাপকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। তারা ঈমামকে ভাল গুণের প্রতিমূর্তিও বানিয়ে ছাড়লো। শেখ বেশ ভালোভাবেই বুঝলো। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল।

"খোদার কসম, আমিও তো এ-কথাই বলি। কিন্তু লোকজন যেভাবে বলাবলি করছিল তাতে তো আমার সন্দেহই হচ্ছিল। ওদের বাপ-দাদার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। "

"শেখ সাহেব, ওরা আপনার প্রতি ঈর্ষাকাতর। এমন সফল সন্তানের জন্য ওরা আপনাকে হিংসা করে।"

"কিছু মনে করবেন না। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। ভ্রমনটা বৃথা যায়নি। আপনাদের সাথে দেখা হয়ে বেশ আনন্দ পেলাম। "

শেখ যাওয়ার জন্য দাঁড়ালো। মনে পুরোপুরি প্রশান্তি। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হাত বাড়িয়ে দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে গাধাটানা এক গাড়ি বোঝাই মহিলা দৃষ্টির গোচরে আসলো। গান গাইতে গাইতে তাদের গলা চড়লো। এদের একজন ফেজ টুপি পড়ে আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে পেট আর কোমর দোলাচ্ছিল। নাদুস-নুদুস শরীরের সর্দারনী মাথায় লাল দোপাট্টা লাগিয়ে আর গাড়িতে ছামিয়ানা টানিয়ে ঢোল বাজাচ্ছে । সেইসাথে বাকি মহিলারা হাত তালি দিয়ে চলেছে।

এ দৃশ্য অনাকর্ষণীয়ভাবেই অতিক্রান্ত হচ্ছিল। মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না এতে, আর এরকম অনেক গাড়িই বইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। যাইহোক, অঘটনটা ঘটল যখন মহিলাদের একজন আমাদের বন্ধু ঈমামকে তার বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে আবিষ্কার করল। তাঁর হাত প্রসারিত হলো শেখ বারকাক্বীর দিকে তাঁকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে।

বুক চাপড়ে মহিলাটি উচ্চস্বরে ডাকলো:

"ওই ছেমরি তাফিদা, দেখ তো, ঐ যে ওখানে ঈমাম না?"

"নবীজীর কসম, সে-ই তো। "

কয়েকটা কণ্ঠ একসাথে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, "হ ঈমামই তো। " সর্দারনী চিৎকার করে বলে, " এই শেখদের মধ্যে ও কী করে?" মহিলারা গাড়ি থামাতে বলে। তাদের একজন নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। চিৎকার করে বলে, "ওই আমড়া কাঠের ঢেঁকির কাছ থেকে আমি গত মাসের বিশ ট্যাকা পাই। ঐ ব্যাটা, ট্যাকা কই?"

এই ঘটনার পর শেখ তার ছেলেকে নিয়ে কেটে পড়লো। আমার বাবা আর ওদের দিকে তাকালেন না। শেখ বারকাক্বীও আর কখনও ওদের দিকে তাকালেন না।